জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

জাতীয় ঐক্য
ও
গণতন্ত্রের ভিত্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আব্বাস আলী খান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আব্বাস আলী খান

প্রকাশক

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচালক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৮৩১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর '৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ '৯৬

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ ৯.০০ টাকা

সূচীপত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি

মানবীয় স্বভাবের বিভিন্নতা একটি প্রাকৃতিক জিনিস, যা কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ যতোক্ষণ মানুষ থাকবে, ততোক্ষণ তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি, নিজস্ব রুচি এবং ব্যক্তিগত একক মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা অবশ্যই থাকবে। আর সব মানুষ সকল বিষয়ে একমত ও সমমনা হবে- এটাও কখনো হতে পারেনা।

পক্ষান্তরে সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করাও স্বয়ং মানুষের স্বভাবেরই এক অনিবার্য দাবী, যা উপেক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। এ সামাজিক জীবনও কায়েম্ হতে পারেনা, যতোক্ষণ না মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কাজ কর্মে সাহায্য সহযোগিতা ও ধ্যান ধারণায় ঐক্য থাকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হয় এবং মত পার্থক্যের মধ্যে সহনশীলতা থাকে। একটা বড় সমাজ তো দূরের কথা, একটা ক্ষুদ্র পরিবারও নির্বিঘ্নে চলতে পারেনা, যদি তার সদস্যদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কথায় কথায় সংঘর্ষশীল হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো অবস্থাই সৃষ্টি না হয়।

এটা মানবীয় স্বভাবের দুটি স্বতন্ত্র ও অনেকাংশে দুটি বিপরীতমুখী দাবী। এ অবস্থায় একটা সফল 'জীবন ব্যবস্থা' কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি তাদের দ্বন্দ-সংঘর্ষ প্রতিরোধ করা যায় এবং তাদের মধ্যে আপোষ-নিস্পত্তির এমন পথ খুঁজে বের করা যায়, যাতে করে এ উভয় দাবী পূরণ হতে পারে। দুনিয়ায় যেখানেই কোনো গঠনমূলক উন্নতি হয়েছে তা হয়েছে তখন, যখন সমাজ এমন কিছু মৌলিক নীতি অবলম্বন করেছে যার সাথে অধিকাংশ লোক একমত হয়েছে এবং সে ঐক্যমতে এমন কিছু অবকাশও রাখা হয়েছে, যার মধ্যে স্বভাবগত মত পার্থক্যের দাবীও পূরণ হতে পেরেছে। যেখানে এমনটি সম্ভব হয়নি, সেখানে গঠনমূলক অগ্রগতি থেমে গেছে এবং ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পরও আমাদের পরিবর্তন হয়নি

বিগত কয়েক দশকে আমাদের দেশের যে অবস্থা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট জানতে পারা যায় যে, তার প্রকৃত কারণ হলো ঐক্যের ভিত্তি খুঁজে বের করতে আমাদের ব্যর্থতা। আমাদের ইচ্ছামত জীবন গড়ে তোলার অধিকার লাভ করার পর দীর্ঘকাল অতীত হয়ে গেছে; কিন্তু পূর্বে আমরা যেখানে ছিলাম, এখনো সেখানেই রয়েছি। আমাদের এখতিয়ারবিহীন তথা গোলামীর যুগে আমাদের যা অবস্থা ছিল, এখতিয়ার লাভ করার পর তা পরিবর্তন করার অথবা তাকে উন্নততর করার কোনো সফল প্রচেষ্টা আমরা করতে পারিনি। আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো ও তার মেজাজ-প্রকৃতি তেমনি রয়েছে। আইন ব্যবস্থা তাই রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তেমনি রয়েছে। আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও তাই আছে। আমাদের ধর্মীয় অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোনো কিছুর সংস্কার, সংশোধন ও উন্নতির জন্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারিনি। এমনকি পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তার দিক নির্ণয় করতেও আমরা সক্ষম হইনি। স্বাধীনতার জন্যে আমাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা তো এ উদ্দেশ্যেই ছিল যে আমরা পরাধীন যুগের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট ছিলামনা এবং তাকে বদলাবার ও উন্নততর বানাবার জন্যে আমাদের আপন ইচ্ছা ও মর্জি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এর পেছনে এমন এক কারণ নিহিত রয়েছে যার জন্যে আমরা আমাদের ইচ্ছাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।

সে কারণটি কি? তা এছাড়া আর কিছু নয় যে, আমাদের মধ্যে বহুমুখী মতপার্থক্যের জোয়ার এসেছে। চিন্তা ও মতাদর্শে মতানৈক্য, উদ্দেশ্য ও আশা-আকাংখায় মতানৈক্য, দল-উপদলে মতানৈক্য। আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগতভাবে নতুন নতুন মতানৈক্য-মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একজন কিছু করতে চাইলে দ্বিতীয়জন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যজন কিছু করতে চাইলে তৃতীয় আরেকজন তা নস্যাত করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়। ফলে কেউ-ই কিছু করতে পারেনা। এ পরিস্থিতি সবদিক দিয়ে গঠনমূলক কাজের পথ রোধ করে আছে। এ সুযোগে ধ্বংস নির্বিঘ্নে তার

নিজস্ব ধারায় কাজ করে চলেছে। আমাদের কেউ তার কামনা না-ই বা করুক।

গঠনমূলক উপাদান খুঁজে বের করা কঠিন নয়

যদি আমরা নিজেরা নিজেদের শত্রু না হয়ে থাকি, তাহলে মতানৈক্য, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার অন্ধ উন্মাদনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং এমন কিছু ভিত্তি তালাশ করার জন্যে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে যার উপর সকলে অথবা অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক একমত হতে পারে। যার ফলে আমাদের শক্তি সামর্থ ধ্বংসাত্মক কাজের পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এরূপ বুনিয়াদ তালাশ করা প্রকৃতই কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন শুধু আমাদের মন মানসিকতাকে ঝগড়া বিবাদের অজুহাত খুঁজে খুঁজে বের করার পরিবর্তে ঐক্যের ভিত্তি খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত করা। একটুখানি দৃষ্টিভংগী বদলে গেলেই আমরা দেখতে পাব ঐক্যের এসব ভিত্তি আমাদের নিকটেই রয়েছে। সেগুলোকে পেতে পারি আমরা আমাদের ধর্মের মধ্যে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে। আরো পেতে পারি পার্থিব অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির সুস্থ ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনার মধ্যে।

জাতীয় ঐক্যের পাঁচটি মূলনীতি

আমরা এখানে এমন একটি বুনিয়াদী মূলনীতি চিহ্নিত করতে চাই,যার ভিত্তিতে ঐক্য সম্ভব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যেন তা চিন্তাভাবনা করে দেখেন। এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম ঐ সব মূলনীতির উল্লেখ করছি যা গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে জরুরী। কারণ পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, তাহলে দেশের জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে অর্থহীন।

১. সর্বাবস্থায় সততা ও সুবিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

সর্বপ্রথম যে কথাটির উপর বিভিন্ন মতাদর্শের দল ও ব্যক্তির একমত হওয়া উচিত, তা হচ্ছে সততা ও পারস্পরিক সুবিচার। মত পার্থক্য যদি

ঈমানদারীর সাথে হয় এবং তার নির্দিষ্ট সীমা রেখার ভিতরে হয়, তাহলে অধিকাংশ সময় তা লাভজনক হয়। কারণ এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে লোকের সামনে উপস্থাপিত হয় এবং তা দেখে তার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে লোকেরা স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর তা যদি লাভজনক না ও হয় তো নিদেন পক্ষে ক্ষতিকর হবেনা। পক্ষান্তরে সমাজের জন্যে এর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারেনা যে, কোনো ব্যক্তির কারো সাথে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে "যুদ্ধে সব কিছুই ন্যায়সংগত" এ শয়তানী নীতি অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের উপর নানান ধরনের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে থাকে। জেনে শুনে তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তার দৃষ্টিভংগীকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করে পেশ করে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য হলেই তাকে গাদ্দার ও দেশের দুশমন বলে আখ্যায়িত করে। ধর্মীয় মতবিরোধ হলে তার দ্বীন ও ঈমানকে পর্যন্ত অভিযুক্ত করে বসে এবং কোমর বেঁধে এমনভাবে তার পেছনে লেগে যায় যেন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। মতবিরোধের এ পন্থা পদ্ধতি যে শুধু নৈতিক দিক দিয়ে দূষণীয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে পাপ, তাই নয়, বরঞ্চ বাস্তব ক্ষেত্রেও এর দ্বারা অসংখ্য অনিষ্ট অনাচার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বাড়তে থাকে। এর জন্যে জনগণ প্রতারিত হয় এবং বিতর্কিত ব্যাপারে তারা কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনা। তার ফলে সামাজিক পরিবেশে এমন উত্তেজনা-অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে যে, তা সহযোগিতা-সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাত-সংঘর্ষেরই সহায়ক হয়। তাতে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা দলের সাময়িক কিছু লাভ হলেও হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জাতির যে মহাক্ষতি হয়, তার থেকে শেষ পর্যন্ত তারাও রক্ষা পায়না, যারা মতবিরোধের এ গর্হিত পন্থাকে ভাল মনে করে গ্রহন করে। মংগল শুধু এতেই রয়েছে যে, কারো সাথে আমাদের যতোই মতবিরোধ ও শত্রুতা থাকনা কেন, আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই সততা পরিহার না করি এবং প্রতিপক্ষের সাথে তেমনি সুবিচার করি, যেমনটি নিজেদের জন্যে চাই।

২. পারস্পরিক সহনশীলতা এবং অন্যের মত প্রকাশের অধিকার মেনে নেয়া ঃ

অনুরূপ প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, মতবিরোধের মধ্যে সহনশীলতা, একে অপরের দৃষ্টিভংগী বুঝতে চেষ্টা করা এবং অপরের মত প্রকাশের অধিকার মেনে নেয়া। নিজের মতকে সঠিক মনে করা এবং তার প্রতি অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মতামত প্রকাশের সর্বস্বত্ব নিজের জন্যে সংরক্ষিত রাখা ব্যক্তিত্ববাদের এমন বাড়াবাড়ি যা সামাজিক জীবনের সাথে সংগতিশীল হতে পারেনা। "ধামাদের মত থেকে ভিন্ন কোনো অভিমতে নিষ্ঠা ও সদিচ্ছা থাকতে পারেনা। অতএব যারাই ভিন্ন অভিমত পোষণ করে, তারা অবশ্যই বেঈমান ও দুরভিসন্ধি পোষণকারী"-এ ধরণের অমূলক ধারণা অধিকতর অনিষ্টকারী। তার ফলে সমাজে ব্যাপক অনাস্থা অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মতপার্থক্য শত্রুতায় পরিণত হয় এবং একই স্থানে বসবাসকারী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী অন্যের দৃষ্টিভংগী উপলব্ধি করে কোনো আপোষ মীমাংসায় পোঁছতে পারেনা। এর একমাত্র পরিণাম এই হতে পারে যে, সমাজ কাঠামোর সদস্যরা সুদীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে। যতোক্ষণ না তাদের কোনো একটি অন্যান্যদের খতম করে দেবে ততোক্ষণ কোন গঠনমূলক কাজ হতে পারবেনা। অথবা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে প্রত্যেক শ্রেণীই শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের স্থলে আল্লাহ্ তায়ালা অন্য কোনো জাতিকে গঠনমূলক কাজের খেদমতে লাগিয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে অসহিষ্ণুতা, অনাস্থা-অবিশ্বাস এবং আত্মগরিমার এ রোগ মহামারী আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার থেকে অতিঅল্প লোকই মুক্ত আছে। সরকার ও ক্ষমতাসীনগণ এ রোগে আক্রান্ত। রাজনৈতিক দলগুলোও এ রোগে ভুগছে। ধর্মীয় দলগুলোও এতে লিপ্ত রয়েছে। এমন কি বস্তি, মহল্লা ও পল্লীগ্রামও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এর প্রতিকার এ ভাবেই হতে পারে যে, যারা আপন আপন পরিমন্ডলে প্রভাব প্রতিপত্তি রাখেন তারা তাদের দৃষ্টিভংগী ও আচরণ পরিবর্তন করবেন এবং নিজের কার্যকলাপের দ্বারা তাদের প্রভাবাধীন লোকদের ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উদারতার শিক্ষা দেবেন।

৩. বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা পরিহার করতে হবে

তৃতীয়ত, যারা সমাজ জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছে, তাদের উচিত নিজ নিজ শক্তি-সামর্থকে অন্যদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদে ব্যয় করার পরিবর্তে যথার্থ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা। এতে সন্দেহ নেই যে, অনেক সময় কোনো জিনিসকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার বিপরীত জিনিসকে অস্বীকার ও প্রত্যাখান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সে প্রত্যাখান ও অস্বীকৃতিকে সে পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত, যতোটুকু না হলে নয়। আসল কাজ ইতিবাচক ও গঠনমূলক হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয়। পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের দেশে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কেউ কোনো কাজ করলে তার নিন্দা করা হয় এবং জনগণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। কিছু লোক এ ধরণের নেতিবাচক কাজ ছাড়া গঠনমূলক কাজ করেই না। কিছু লোক এমনও আছে যারা মনে করে তাদের গঠনমূলক কাজের প্রচার ও প্রসার হতে পারে যদি অন্যান্য যারা মাঠে-ময়দানে আছে তাদেরকে এবং তাদের সকল কাজকর্মকে অস্বীকার করা হয়। এ একটা চরম ভ্রান্ত কর্ম পদ্ধতি। এর দ্বারা বৃহত্তর অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। এতে তিক্ততা বাড়ে। এর ফলে জনগণের মধ্যে অনাস্থা-অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং তারা গঠনমূলক চিন্তা করার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক চিন্তা করতে বাধ্য হয়। এ দৃষ্টিভংগী ও আচরণ বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশের জন্যে মারাত্মক। এ সময় আমাদের জাতীয় জীবনে বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে। এর কারণ হচ্ছে, এক শ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে জনগণের আস্থা উঠে গেছে। এবং দ্বিতীয় কোনো নেতৃত্বের প্রতি তারা আস্থাশীল হতে পারছে না। এ শূন্যতা যদি কোনো কিছুর দ্বারা পূরণ হতে পারে, তাহলো এই যে, বিভিন্ন দলের কাছে যা কিছুই গঠনমূলক কর্মসূচী আছে তা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করবে যাতে করে জনগণ বুঝতে পারে যে, কে কি করছে, কি করতে চায় এবং কার দ্বারা কোন্ কাজ সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যেতে পারে। এ কর্মপদ্ধতিই অবশেষে জাতিকে এক বা একাধিক দলের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে এবং সামগ্রিক শক্তির দ্বারা গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব হবে। কিন্তু অবস্থা যদি এই হয় যে, প্রত্যেকে তার নিজের প্রতি জাতির আস্থা অর্জন করার পরিবর্তে অন্যের প্রতি আস্থা বিনষ্ট করার কাজে

লিপ্ত হয়, তাহলে তার পরিণাম এছাড়া আর কিছুই হবেনা যে, কেউই জাতির আস্থা অর্জন করতে পারবেনা এবং জাতি মস্তকবিহীন বা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।

৪. বলপ্রয়োগ ও ধোকা প্রতারণার পরিবর্তে যুক্তি প্রদর্শন ও প্রেরণাদান

আরো একটি জিনিস যা সার্বিক নীতি হিসেবে সকলের গ্রহন করা উচিত। তাহলো এই যে, নিজের ইচ্ছাকে জোর পূর্বক অপরের উপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার কারো নেই। যে কেউ নিজের বক্তব্যের প্রতি অপরের সমর্থন আদায় করতে চায়, সে জোর পূর্বক নয়, বরঞ্চ যুক্তির মাধ্যমে তা আদায় করবে এবং নিজের কোনো প্রস্তাবকে যদি সমাজ জীবনে কার্যকর করতে চায়, সে জোর পূর্বক না করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানুষকে রাজী করে তা কার্যকর করবে। কেউ যদি কোনো কিছুকে সঠিক মনে করে এবং দেশ ও জাতির জন্যে মংগলকর মনে করে, তার জন্যে এটা হতে পারেনা যে সে হঠাৎ ক্ষমতা লাভ করে বলপূর্বক তা সমাজে কার্যকর করার চেষ্টা করবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে- সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রতিবন্ধকতা ও তিক্ততা। এভাবে তো কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু সফলকাম হওয়া যায়না। কারণ কোনো কিছুর সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন তা জনগণ কর্তৃক সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহন করা। যেসব লোক কোনো প্রকার শক্তির অধিকারী হয়, তা সে রাষ্ট্রীয় শক্তিই হোক, ধন সম্পদের শক্তি হোক অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি হোক- তারা সাধারণত এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, জনগণকে তাদের কথা মানাবার জন্যে এবং তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে জনগণের স্বীকৃতি আদায়ের দীর্ঘ পথ অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই, শক্তি প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাস এ কথাই বলে যে, এধরণের বল প্রয়োগ অবশেষে জাতির মেজাজ প্রকৃতি বিকৃত করে দিয়েছে। দেশের আইন শৃংখলা চুরমার করে দিয়েছে এবং তাদেরকে শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথ থেকে সরিয়ে অবাঞ্ছিত বিপ্লবের পথে ঠেলে দিয়েছে। দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যদি সত্যিই দেশের শুভাকাংখী হন, তাহলে ধোকা প্রতারণার পরিবর্তে যুক্তির মাধ্যমে এবং শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে প্রেরণা ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে কাজ আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। এমনি ভাবে

জনসাধারণও যদি নিজেদের অকল্যাণ না চায়, তাহলে তাদেরও এ ব্যাপরে একমত হওয়া উচিত যে, তারা এখানে কাউকে ধোকা প্রতারণা ও শক্তি প্রয়োগ করতে দেবেনা।

৫. পঞ্চম মূলনীতি

এ প্রসংগে শেষ কথা এইযে, আমাদের ছোটখাটো বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী পরিহার করে সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করতে হবে। কোনো ধর্মীয় দলের লোকদের সমমনা লোকদের সাথে ঘনিষ্ট হওয়া, এক ভাষাভাষী লোকদের অনুরূপ ভাষাভাষীদের নিকটতর হওয়া অথবা এক অঞ্চলের লোকের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো প্রকারেই এটাকে নিন্দা করা যাবেনা। আর এসব মুছে ফেলাও বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু এ জাতীয় ছোট ছোট দল যখন তাদের সীমাবদ্ধ দলীয় স্বার্থের ভিত্তিতে গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা পোষণ করা শুরু করে এবং আপন দলীয় স্বার্থ অথবা উদ্দেশ্যের জন্যে সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তা দেশ ও জাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তা যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়ে পড়বে। তখন তার কুফল ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে সেসব দলগুলোও বেঁচে থাকতে পারেনা। ভালো করে মনে রাখা উচিত যে, যে কোনো দল, গোত্র, বংশ ভাষা অথবা অঞ্চলের সাথেই তার সম্পর্ক থাকনা কেন তার সাথে তার স্বার্থ যেন স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করতে না পারে। এ স্বার্থ যদি অন্ধ বিদ্বেষের রূপ ধারণ করে, তাহলে তা-মারাত্মক হবে। প্রত্যেক বিদ্বেষ প্রত্যুত্তরে আরেকটি বিদ্বেষের জন্ম দেয়। বিদ্বেষের মুকাবিলায় বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি না করে পারেনা। অতঃপর সে জাতির আর মংগল কি করে হতে পারে যার অংগ প্রত্যংগ পরস্পর সংঘাতশীল হয়।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থাও এমনি। কোনো দেশের কল্যাণের জন্যে যারা একটা বিশেষ মতবাদ ও কর্মসূচী রাখেন তাদের সংগঠিত হয়ে আপন পদ্ধতিতে কাজ করার অধিকার থাকবে। তবে দু'টি শর্তে। প্রথম শর্ত হলো, তারা প্রকৃত পক্ষে সদুদ্দেশ্যে দেশের কল্যাণের

জন্যে আগ্রহী ও সচেষ্ট হবে।। দ্বিতীয় শর্ত হলো, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা অথবা সমঝোতা হতে হবে নীতিগত, ন্যায় সংগত এবং সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পন্থা-পদ্ধতিতে সীমিত। এ দু'য়ের যে কোনো একটি শর্ত পালন না করলে দলগুলোর অস্তিত্ব দেশের জন্যে বিপদজনক হয়ে পড়বে। দলীয় স্বার্থ এবং দলের নেতা ও কর্মীদের স্বার্থই যদি কোনো দলের চেষ্টা চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়, তবে তাকে রাজনৈতিক দল বলা যাবেনা। তা হবে ডাকাত দল। আর যদি বিভিন্ন দল পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নানান ধরণের ন্যায় অন্যায় ফাঁকি বাজি করতে থাকে এবং কোনো নীতির উপর সমঝোতা করার পরিবর্তে ক্ষমতা এবং ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার জন্যে করে, তাহলে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেমন দেশের জন্যে মারাত্মক হবে, তেমনি হবে তাদের সমঝোতাও।

শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি

উপরে বর্ণিত পাঁচটি মূলনীতি দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ যদি মেনে চলতে রাজী না হয়, তাহলে এখানে আদৌ সে পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবেনা, যেখানে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তির উপর ঐক্যমত সম্ভব হতে পারে। কিংবা যদি এ ধরণের কোনো কৃত্রিম ঐক্যমত হয়েও যায়, তবুও তা কার্যতঃ কোনো কল্যাণকর সুফল দিতে পারবেনা। তারপর আমাদের দেখা উচিত যে, সে ভিত্তিগুলো কি হতে পারে, যার উপর একটি সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশে বেশী বেশী ঐক্যসহ জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

১. কুরআন ও সুন্নাহর প্রাধান্য

এসবের মধ্যে প্রথম ভিত্তি আমরা মনে করি, দেশের ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহকে হেদায়েত ও আইনের মূল উৎস হিসেবে মেনে নিতে হবে। একে আমরা ঐক্যের ভিত্তি এজন্যে বলছি যে, দেশের অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। তারা এ ভিত্তি ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হতে পারবেনা। তাদের আকীদা বিশ্বাস এর দাবী করে, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এটাই দাবী করে, এবং তাদের নিকট অতীতের ইতিহাসও তাই দাবী করে। তাদের জন্যে এটা সহ্য করা বড়ই

দুস্কর বরং অসম্ভব যে, যে আল্লাহ ও রসূলের উপর তারা ঈমান রাখে, জেনে বুঝে তারা তাঁদের নির্দেশাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তাঁদের নির্দেশের বিপরীত অন্য কিছু নিজেদের ইচ্ছামাফিক চালু করবে। তারা সেসব আইন-বিধান জারী করার ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করতে পারেনা এবং ঐসব আইনকে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে চলতেও পারেনা, যেগুলোকে তারা বাতিল ও ভ্রান্ত মনে করে। অনৈসলামী জীবন ব্যবস্থার অধীন জীবন-যাপন তারা মেনে নিতে পারেনা। অবশ্যি এটা সম্ভব যে, যদি কোনো স্বৈরাচারী শক্তি জবরদস্তি তাদের এ উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় তাহলে তারা সেটাকে বাধ্য হয়ে সেভাবেই বরদাশত করবে যেভাবে ইংরেজ শাসন কয়েমের পর তারা বাধ্য হয়ে বরদাশত করেছিল। কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে, কোনো অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর বলপূর্বক কোনো শাসন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাকে সাফল্যের সাথে চালানো যাবে, তাহলে তাকে অবশ্যই নির্বোধ বলা হবে। এ ভিত্তিটির সাথে যারা একমত নন, তারা চারটি দলে বিভক্ত। একঃ সেই সব মুসলমান যারা স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এবং সামাজিক আচার আচরণে পাশ্চাত্য সভ্যতার এতটা ভক্ত ও পূজারী হয়ে পড়েছে যে, এখন ইসলামী জীবন-পদ্ধতির দিকে ফিরে আসার চিন্তা তাদেরকে ভীত-শংকিত করে। দুইঃ সেসব মুসলমান যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেনা কিন্তু তারা পাশ্চাত্য মতবাদে এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, এখন আর ইসলামের প্রতি তাদের আস্থা বাকী নেই। এ উভয় শ্রেণীর লোক তাদের বিশেষ মন মানসিকতার কারণে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ় সংকল্প। কারণ, এটাই তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও রুচির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তিনঃ ঐসব মুসলমান, যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অস্বীকার করেনা, কিন্তু তারা সুন্নাতকে বাদ দিয়ে শুধু কুরআন নিয়ে চলতে চায়। চারঃ অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা ইসলামী ব্যবস্থার মুকাবিলায় ধর্মহীন ব্যবস্থাকেই প্রধান্য দেয়।

মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর অনুপাত সামাজিক ভাবে হাজারে একজনও নয়। এহেন অবস্থায় এটা কি কখনো সুবিচার হতে

পারে যে, দেশের কোটি কোটি মানুষ যে ভিত্তির উপর দেশের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়- তা করা হবেনা, হবে এমন বুনিয়াদের উপর যার অভিলাষী সংখ্যায় মাত্র কয়েক হাজারের বেশী হবেনা। মনে করুন, যদি এমন করাও হয়, তাহলে এমন কোন্ শক্তি আছে যা এ ব্যবস্থাকে সাফল্যের সাথে চালাবার জন্যে কোটি কোটি মানুষের আন্তরিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবে? এসব ভদ্র লোকদের আমরা একথা বলিনা যে, আপনারা আপনাদের চিন্তাধারা রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলুন। অবশ্যি যে কথা তাদেরকে বলতে চাই, তাহলো, ঐসব ভিত্তির উপর জীবন-বিধান কায়েম করলেই দেশের কল্যাণ হতে পারে, যার উপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের একমত হওয়া সম্ভব। এ মতৈক্য ধর্মহীন ব্যবস্থা অথবা সুন্নাতবিহীন-কুরআনের উপর কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব আপনারা যে ধরণের চিন্তাভাবনাই পোষণ করুননা কেন, প্রতিবন্ধকতা পরিস্কার করুন।

এখন রইলো আমাদের আপন দেশবাসী অমুসলমানগণ। তাদেরকে আগেও বহুবার এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং এখনো এ নিশ্চয়তা দেয়ার সকল প্রকার চেষ্টা করা হবে যে, মুসলমানদের ধর্ম তাদের উপর কখনো চাপিয়ে দেয়া হবেনা। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হবেনা। তাদের পারিবারিক আইন (Personal Law) তাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে এবং দুনিয়ার যে কোনো দেশের সংখ্যা লঘুরা যে অধিকার লাভ করে থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার কার্যতঃ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এখানে তারা লাভ করবে। এর পরেও তাদের এ দাবী কি করে ন্যায়সংগত হতে পারে যে, দেশের শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার পরিবর্তে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছামত হোক। তাছাড়া এখানে যখন তাদের ধর্মীয় আইন প্রবর্তনের কোনো প্রশ্নই নেই, তখন এ দেশের শাসনব্যবস্থা ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে হোক অথবা রোমীয় আইনের মূলনীতি অনুযায়ী হোক, তাতে তাদের কিছুই যায় আসেনা। এ উভয় আইনই তাদের কাছে সমভাবে বিপরীতধর্মী। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা একটির বিরোধিতা এবং অপরটির প্রতিষ্ঠা কামনা করছে?

কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের ভিত্তি বানাবার বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এ

দেখানো হয় যে, কুরআনের ব্যাখ্যায় রয়েছে বহুমতপার্থক্য এবং কোনো একটি ব্যাখ্যাও সর্ববাদিসম্মত নয়। আর সুন্নাতের ব্যাপারে শুধুমাত্র ব্যাখ্যার মতবিরোধই নেই, বরঞ্চ সুন্নাত কোন্ বস্তু এ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। কাজেই কি করে এ দাবী করা যেতে পারে যে, এটা এমন এক ভিত্তি যার প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একমত ?

এর জবাব এই যে, আমরা কুরআনের কোনো বিশেষ ব্যাখ্যাকে নয়, বরঞ্চ স্বয়ং কুরআনকে এবং সুন্নাতের ব্যাপারে পথ ও মতকে নয়, বরঞ্চ সুন্নাতে রাসূলকে (সঃ) জীবন বিধানের ভিত্তি নির্ধারিত করছি আর এ ভিত্তি মুসলমানদের সর্বসম্মত।

এখন রইলো মত পার্থক্য। তা দুটি ব্যাপারেই দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক যেসব দলে রয়েছে (যেমন হানাফী, আহলে হাদীস) তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর সেসব ব্যাখ্যাই কার্যকর হবে যা তাদের কাছে সর্বস্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ যেসব বিষয়াদি সমগ্র দেশের সাথে সম্পর্কিত, সে বিষয়ে কার্যত ঐসব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে মেনে নিতে হবে যার উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ একমত। সংখ্যা লঘুর এ অধিকার থাকবে যে, তারা ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে থেকে আপন দৃষ্টিকোণের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারবে।

২. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় যে ভিত্তির উপর ঐক্যমত গঠন করা সম্ভব, তা হলো গণতন্ত্র। কুরআন সুন্নাহর অভিপ্রায়ও তাই এবং দেশবাসীর আশা-আকাংখার দাবীও তাই। এ দেশ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নয়। বরঞ্চ সমগ্র দেশবাসীর। সুতরাং এর শাসন ব্যবস্থা তাদের সকলের অথবা অন্তত সংখ্যা গরিষ্ঠের মর্জী মোতাবেক চলতে হবে। নীতিগতভাবে এবং কার্যত তাদের এ অধিকার থাকা উচিত যে, তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী শাসক নির্বাচন করবে এবং স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করবে।

এ ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে দুনিয়ায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং অনেক নতুন নতুন পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে।

বিশেষ কোনো পন্থা অবলম্বনের প্রশ্ন এখানে নয়। বরঞ্চ প্রশ্ন এখানে যে পন্থা অবলম্বন করা হবে, তাতে গণতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থা বিদ্যমান থাকবে কিনা? এখানে যদি এমন কোনো শাসনব্যবস্থা চালু করা হয় যার মধ্যে জনগণের আশা-আকাংখার পরিবর্তে কোনো বিশেষ শ্রেণীর মর্জী প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তাকে যতোই ফলাও করে গণতন্ত্র শিরোনাম দেয়া হোক, তার প্রতি জনগণের সন্তুষ্ট হওয়া এবং সন্তুষ্ট থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাকে সাফল্যের সাথে চালাবার জন্যে সকলের অথবা সংখাগরিষ্ঠ জনগণের আন্তরিক সহযোগিতাও পাওয়া যাবেনা। এ ধরণের শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ থাকলে শুধু সেই শ্রেণীরই থাকবে যাদের ইচ্ছা ও মর্জী সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে। আর কোনো সীমিত শ্রেণীর অনুরাগ যে শুধু দেশে কোনো স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের নিশ্চয়তাই দান করতে পারেনা তা নয়, বরঞ্চ স্বভাবতই তা ধীরে ধীরে জনগণের আশা-আকাংখার বিপরীত হতে থাকবে এবং এ বৈপরিত্য এক সংঘাত সংঘর্ষে রূপান্তরিত হবে। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তার একমাত্র পন্থা এই যে, যারা দেশের ভবিষ্যত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারেন, গণতন্ত্রের মূলনীতি আন্তরিকতার সাথে তাঁদেরকে মেনে নিতে হবে এবং তারপর তারা সদিচ্ছা ও নিষ্ঠা সহকারে এমন শাসনব্যবস্থা তৈরী করবেন যার মধ্যে এ মূলনীতি কার্যকর হতে পারে।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, গণতন্ত্রের মধ্যেও অনেক দোষত্রুটি আছে। এ দোষত্রুটি আবার বহুল পরিমাপে বেড়ে যায় যখন দেশবাসীর মধ্যে অনুভূতি শক্তি হ্রাস পায়, চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং এমন সব লোকের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, যারা দেশের সামগ্রিক স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত, বংশীয়, আঞ্চলিক এবং দলীয় স্বার্থকে অধিকতর প্রিয় মনে করে। এসব সত্যকে মেনে নেয়ার পরেও এ বৃহত্তর সত্যটা অস্বীকার করা যায়না যে, কোনো জাতির এসব দুর্বলতা দূর করার এবং তাকে সামগ্রিকভাবে সচেতন জাতি হিসাবে গড়ে তোলার প্রকৃত পন্থা এ গণতন্ত্র। আমরা দেখতে পাই একটি মানুষ তখনই নিজের শক্তি সামর্থের সাহায্যে জীবন যাপনের যোগ্যতা লাভ করে, যখন তার স্বাধীনভাবে কাজ করার

এবং আপন দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়। প্রথম প্রথম তার মধ্যে নানা রকম দুর্বলতা থাকে যার জন্যে তাকে হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু অবশেষে অভিজ্ঞতার শিক্ষাকেন্দ্র তাকে সব কিছু দেখিয়ে দেয় এবং পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়ে হোঁচট খেতে খেতে সে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত হয়। নতুবা সে যদি চিরকাল কোনো অভিভাবকের অধীনে জীবন যাপন করতে থাকে তবে সে সারা জীবন নাবালক বা অপরিপক্কই থেকে যায়। এরূপ অবস্থা একটা জাতিরও হয়ে থাকে। একটা জাতিও তার নাবালকত্ব কাটিয়ে নিতে পারেনা যতোক্ষণ না সে এ বাস্তব সত্য অনুধাবন করে যে, সকল ভালোমন্দের জন্যে সে স্বয়ং দায়ী এবং তার কাজকর্মের ভালোমন্দ হওয়াটা নির্ভর করে তার আপন সিদ্ধান্তের উপর। প্রথম প্রথম তার অনেক ভুল ত্রুটি হবে এবং তার পরিণামও তাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা ব্যতীত সঠিক ভাবে কাজ করার যোগ্যতা লাভের আর কোনো পথ নেই। তাছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই এমন এক পদ্ধতি যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, দেশ তার নিজের। দেশের ভালোমন্দ তার নিজেরই ভালোমন্দ এবং ভালো ও মন্দ হওয়াটা নির্ভর করে তার সিদ্ধান্ত সঠিক বা ভ্রান্ত হওয়ার উপর। এটাই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামষ্টিক অনুভূতি জাগ্রত করে। এতে করে একজন ব্যক্তির মধ্যে দেশের কার্যকলাপে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে অবশেষে এটা সম্ভব হয় যে, দেশের কল্যাণার্থে কাজ করার জন্যে এবং দেশকে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারবে। আর যতো ব্যবস্থা রয়েছে- তা সে রাজতন্ত্র হোক, একনায়কত্ব অথবা মুষ্টিমেয় লোকের শাসন (Oli Garchy) হোক, তার মধ্যে জনগণের অবস্থা এই হয় যে তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। অবস্থার পরিবর্তন অথবা ভাঙাগড়ায় তাদের মতামত ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার যখন কোনো অধিকারই নেই তখন সেসব বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করা তারা ছেড়ে দেয়। গণতন্ত্রের যত প্রকারের দোষত্রুটি থাকনা কেন, এ বিরাট ক্ষতির তুলনায় তা কিছুই নয়।

বিগত নির্বাচনগুলোতে বার বার যে অবস্থা দেখা গেছে সেগুলোকে প্রমাণ

হিসাবে পেশ করে কিছু লোক বলেন, আমাদের দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের অধিবাসীরা তার অনুপযুক্ত। এসব লোক মাঝে মাঝে তার জন্যে বিভিন্ন প্রকারে বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করেন। যেমন কেউ বলেন, এখানে গণতন্ত্র তো অবশ্যই হতে হবে, তবে তা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে একটা উচ্চতর শক্তিরও প্রয়োজন অছে। গণতন্ত্র বিকৃত হয়ে পড়লে এ শক্তি তাকে সংশোধন করে দেবে। কেউ আবার এ ধরণের লুকিয়ে ঢেকে কথা না বলে স্পষ্টই বলেন একটা বিকৃত ধরণের গণতন্ত্র অপেক্ষা একটা শুভাকাংখী ও কর্মতৎপর একনায়কত্ব অনেকগুণে ভালো। কিন্তু এ যাবত এ দেশে যে সব ঘটনা ঘটেছে, ঠান্ডা মাথায় সে সবের উপর চিন্তা ভাবনা করলে কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে এ কথা উপলব্ধি করা কঠিন হবেনা যে, যে বস্তুটি এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তা গণতন্ত্র মোটেই ছিলনা। গণতন্ত্র তো এ জিনিসের নাম যে, সাধারণ মানুষ স্বয়ং তাদের দেশ ও জাতির কাজ কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করবে এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষালাভ করে নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করতে থাকবে। অর্থাৎ একবার অথবা কয়েকবার যদি তাদের নির্বাচন ভুল প্রমাণিত হয় এবং তার পরিণাম তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে তা সংশোধন করতে আসবেনা। বরঞ্চ তারা স্বয়ং একটা প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী তার সংশোধন করতে থাকবে। এটা এখানে কখন হয়েছিল যে এখন তার ব্যর্থতার কথা বলা হচ্ছে? এখানে যা করা হয়েছিল, তা গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের এমন এক সংমিশ্রণ যে এ উভয়ের কোনো একটি ব্যবস্থাও পুরোপুরি সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি। এখন যদি তার পরিণাম মন্দ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা বলা ভুল হবে। তার চেয়ে অধিক মারাত্মক ভুল হলো কোনো প্রচ্ছন্ন অথবা উন্মুক্ত একনায়কত্বের সপক্ষে এ ব্যর্থতাকে প্রমান হিসাবে পেশ করা।

এতো হচ্ছে যুক্তি প্রদর্শনের ভ্রান্তি। এখন রইলো সেসব বিকল্প ব্যবস্থাগুলো যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোকাবিলায় পেশ করা হয়। এ ব্যাপারে আমাদের ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, গণতন্ত্র নস্যাৎ করে একনায়কত্বের পথে চলা যতোটা সহজ, গণতন্ত্রের দিকে ফিরে আসাটা

ততো সহজ নয়। একনায়কত্ব বিনা রক্তপাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করা যায়না। এ কথার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, প্রথমে যারা একনায়কত্বের নেতৃত্ব দেন, তারা সর্বদা নেতৃত্ব দিতে থাকবেন। এমনও হতে পারে যে, কোনো সময় গদি উল্টে যেতে পারে এবং শাসক স্বয়ং শাসিত হয়ে যেতে পারে। বরঞ্চ একনায়কত্বের শিকার ও হতে পারে। এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী এবং একনায়কত্বের প্রতি অনুরাগ পোষণকারী সকলেরই ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তাঁরা কি একনায়কত্বের ওসব পরিণাম ফল মেনে নিতে রাজী আছেন যা তার স্বাভাবিক পরিণাম ফল। একনায়কত্ব যতোই শুভাকাংখী হোকনা কেন এবং যে কোনো নেক নিয়তের সাথে তা কায়েম করা হোকনা কেন, তার মেজাজ প্রকৃতি তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেয় যা তার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়না। এসব বৈশিষ্ট্যের আবার কিছু অনিবার্য প্রতিক্রিয়া অছে যা না হয়ে পারেনা। একনায়কত্ব সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে পারেনা। সে হয় অত্যন্ত তোষামোদপ্রিয়। তার ভাল কাজের খুব বেশী বেশী প্রচার প্রোপাগান্ডা করে এবং দোষক্রটি প্রচ্ছন্ন রাখে। এতে করে এটা সম্ভব হয়না যে, দোষক্রটিগুলো যথাসময় ধরা পড়বে এবং সেসবের তদারক করা যাবে। সে জনমত এবং জনগণের চিন্তাধারা ও মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়না। তার ভেতরে যে সব রদবদল করা হয় তা উন্মুক্ত পন্থায় হয়না বরঞ্চ তা করা হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের মাধ্যমে। জনগণ তা শুধুমাত্র চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। এতে একটা বিশেষ সীমিত মহল দেশের সমগ্র শাসন কর্তৃত্বের মালিক হয়ে পড়ে। তাদের অধীনে এটা সম্ভব হয়না যে, গোটা জাতীয় শক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ও স্বেচ্ছায় কোনো উদ্দেশ্যের জন্যে কর্মতৎপর হবে। তার সূচনা যতোই কল্যাণকর হিসাবে হোকনা কেন, পরিণামে তা একটি স্বৈরাচারী শক্তি না হয়ে থাকেনা এবং জনগণ বিক্ষুব্ধ বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার থেকে বাঁচার চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু এর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার যতো শান্তিপূর্ণ পন্থা হতে পারে, সেগুলো সে বেছে বেছে বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশ এমন এক বিপ্লবের পথে চলতে বাধ্য হয়- যা সহজে তাকে কোনো শুভ গন্তব্যে পৌঁছতে দেয়না।

এরূপ পরিনাম সম্পর্কে যে নিঃস্বার্থভাবে চিন্তাভাবনা করবে সে কখনো গণতন্ত্রের উপর একনায়কত্বকে প্রাধান্য দেবেনা তা সে একনায়কত্বের পদমর্যাদা স্বয়ং তার জন্যেই অর্জিত হোকনা কেন।

৩. গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রাণশক্তি এবং পাঁচটি মূলনীতি

এখন যদি এ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আমাদের দেশের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকই হতে হবে, তাহলে গণতন্ত্রকে তার সত্যিকার প্রাণশক্তিসহ গ্রহণ করতে হবে এবং তার মধ্যে একনায়কত্বের কোনো প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রন করা চলবেনা। কারণ এ ছাড়া গণতন্ত্র সঠিকভাবে চলতে পারেনা এবং সে কোনো সুফলও দেখাতে পারেনা যা তার থেকে আশা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে গণতন্ত্রের সাথে সাথে আরও পাঁচটি মূলনীতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে। তা হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ ক্ষমতা বিভাজন নীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন সভার ক্ষমতা এখতিয়ারের পরিসীমা সুস্পষ্টরূপে পৃথক হবে।

দ্বিতীয়তঃ নাগরিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং তা সংরক্ষণের জন্যে বিচার বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান করা।

তৃতীয়তঃ স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থার ও তার নিরাপত্তার জন্যে এমন আইন প্রণয়ন করা ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহন করা যার থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নির্বাচনের ফলাফল প্রকৃত পক্ষে জনমতের ভিত্তিতেই হবে।

চতুর্থতঃ আইনের শাসন। অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের জন্যে একই আইন হবে এবং সকলেই এ আইন মেনে চলতে বাধ্য হবে। আর আদালতের এ অধিকার থাকবে যে, সকলের উপর সে তা অবাধে প্রয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চমতঃ সরকারী কর্মচারীদের তারা সামরিক হোক অথবা বেসামরিক, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা চলবেনা। তারা প্রত্যেকেই ঐ সব

শাসকের শাসন পদ্ধতি মেনে চলবে যাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আইনানুগ পন্থায় দেশের শাসন ক্ষমতা সমর্পন করবে।

এ পাঁচটি মূলনীতি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যে এমন অপরিহার্য প্রয়োজন যে, তার কোনো একটিকে বাদ দিলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়বে। তারপর সেসব অনাচারই প্রকাশ হতে থাকবে যা কোনো না কোনো ধরনের প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন একনায়কত্বে হয়ে থাকে।

যেমন মনে করুন, যদি দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এখতিয়ার হাসিল হয় যে তাঁরা কোনো সময়ে জনগণের প্রতিনিধিদেরকে বিদায় করে দিয়ে স্বয়ং শাসন করতে থাকবেন, তাহলে এর মধ্যে এবং প্রকাশ্য রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বের মধ্যে পার্থক্য কি রইল? অথবা যদি প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ এমন এখতিয়ার লাভ করে যে, তারা বিচারালয়ের বিবেক এবং তার সুবিচার করার শক্তি প্রভাবিত করবে, তাহলে এর মধ্যে এবং স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে পার্থক্যের কি কারণ থাকতে পারে ? একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অনিষ্টকর দিক হলো, সেখানে শক্তিশালীর মুকাবিলায় দুর্বলের অধিকার আদায় করার শক্তি আদালতের থাকে না।

এরূপ একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যদি শাসকদের এ অধিকার থাকে যে, তারা যখন খুশী লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বক্তৃতা বিবৃতির স্বাধীনতা, জনসমাবেশের স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা হরণ করবে অথচ তাদের অপরাধ কোনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি এবং তারা অপরাধী কিনা এ বিষয়ে তদন্ত করার অধিকারও আদালতের নেই, তাহলে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার সূচনা যতোই গণতান্ত্রিক পন্থায় হোকনা কেন, গণতন্ত্রের মৃত্যুই হয় তার অনিবার্য পরিনাম। কারণ যেখানে সরকারের সমালোচনা করা দুস্কর হয়ে পড়ে সেখানে গণতন্ত্র বেঁচে থাকতে পারেনা। এমন অবস্থায় যে একবার ক্ষমতায় এসে যাবে সে জোর পূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকবে, আর এর নাম অবশ্যই গণতন্ত্র নয়।

৪. নির্বাচন হতে হবে অবাধ এবং আইনের চোখে সকলে হবে সমান

নির্বাচনে স্বাধীনতার ব্যাপারেও একই কথা। গণতন্ত্র তো তাকেই বলে

যে, মানুষ তার স্বাধীন মর্জি মুতাবেক যাকে খুশী তাকে শাসনকার্য চালাবার জন্যে নির্বাচিত করবে। তারপর যখন ইচ্ছা তখন আপন মর্জি মতো তাকে পরিবর্তন করবে। এটা কেমন করে গণতন্ত্র হতে পারে এবং কিভাবে তা অক্ষুন্ন থাকে, যদি চাপ সৃষ্টি করে, প্রলোভন দেখিয়ে, প্রতারণা ও কৌশল অবলম্বন করে নির্বাচনের ফলাফল জনমতের পরিপন্থী করা হয় ? এমতাবস্থায় তো জনগণকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার এবং নির্বাচনের অধিকার দেয়া ও না দেয়া সমান।

সেই সাথে এটারও গুরুত্ব প্রায় সমান যে, দেশে আইন কানুন ও রীতি পদ্ধতি সকলের জন্যে একই রকম হবে। তা সকলের প্রতি কার্যকর হবে এবং কেউ তার খেলাপ করতে পারবেনা। এ হচ্ছে সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন ও ডিক্টেটরশিপের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে দেয়। যেখানে শাসিতের জন্যে এক ধরণের আইন এবং শাসকের জন্যে অন্য আইন, যেখানে আইনের কড়া-কড়ি শুধু দুর্বলের জন্যে, শক্তিমান সর্বদা আইনকে উপেক্ষা করে যা খুশী তাই করতে পারে এবং যেখানে সুবিচারের শক্তি শক্তিমানের মুকাবিলায় আইন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে গণতন্ত্র কখনো কায়েম হতে পারেনা। কায়েম হলেও তা টিকে থাকতে পারেনা। গণতন্ত্র চায় সকলকে সমান করতে এবং এ সাম্যের দাবী হচ্ছে এই যে,আইন সকলের জন্যে এক হবে এবং সকলের জন্যে সমানভাবে বলবৎ হবে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ তার সাফল্যের শর্তাবলী

গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও তার সাফল্যের জন্যে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, সরকার পরিচালনাকারী ও রক্ষণাবেক্ষনকারীকে গণতন্ত্রের মূলনীতি অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে একথা মেনে নিতে হবে যে, দেশ জনগণের এবং তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তাদের স্বাধীন মর্জিমতো যাদেরকে ইচ্ছা দেশের শাসক পরিচালক বানাবে এবং সরকারী কর্মকর্তাগণের (যারা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই কর্মচারী) কর্তব্য হচ্ছে এই যে, জনগণ যাদেরকেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবে. তাদের অধীনে থেকে তারা কাজ করবে। নিষ্ঠা সহকারে যদি এ কথা

মেনে না নিয়ে সরকারী কর্মচারীরা জোট পাকিয়ে এ সিদ্ধান্ত করতে থাকে যে, সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে বা কে করবেনা অথবা এ দায়িত্ব তারা নিজ হাতে তুলে নেবার জন্যে বেঁকে বসে, তাহলে গণতন্ত্র যে একদিনও কায়েম থাকতে পারবেনা, শুধু তাই নয়; বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে নৈতিক দিক দিয়ে এ হবে একটা বড়ো রকমের আত্মসাৎ এবং পরিনামের দিক দিয়ে দেশের জন্যে হবে অত্যন্ত মারাত্মক। এক ব্যক্তির কর্মচারী যদি জোট পাকিয়ে স্বয়ং সে মালিককেই পদানত করে ফেলে এবং তার ঘর-দোর ও বিষয় সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলে এটা বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ ছাড়া আর কি হতে পারে ? এখন এর পরিণাম এ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা যে, যেখানে একবার কর্মচারীগণ ক্ষমতার আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাবে, সেখানে দল একটি নয়, বরঞ্চ বহু দল জন্ম লাভ করবে; একদল অপর দলের মুকাবিলায় ক্ষমতার লড়াই শুরু করবে। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত এক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার লাভ করবে। আর এ উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ার খেলা নির্বাচনের উন্মুক্ত ময়দানে চলতে থাকেনা, চলে যবনিকার অন্তরালে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে। এ অবস্থায় দেশের আইন শৃংখলা ভেঙে পড়াটাও এক নিশ্চিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সময় আমাদের দেশ বহু সমস্যার সন্মুখীন। এ সবের প্রতি মনোযোগ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। মানুষের নৈতিক ও দ্বীনি অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে। অর্থনেতিক দুরাবস্থার সমাধান করতে হবে। মানুষের অজ্ঞতা- নিরক্ষরতা দুর করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষা সংস্কার করতে হবে এবং এমনি অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যার সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এ সবের মধ্যে অগ্রাধিকার যোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদের উপর একমত হতে হবে এবং এ ঐক্যমত হতে হবে সঠিক ভিত্তির উপর। কারণ, যতোক্ষণ তা না হবে, আমরা এ সব সমস্যা সমাধানের জন্যে না কোনো কর্মসূচী বানাতে পারবে, আর না এটা সম্ভব হবে যে, কোনো কর্মসূচী সফল করার জন্যে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল মহল ও উপায় উপকরণ একত্র হয়ে কাজ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, সংকটের যে পাঁক জলাভূমিতে আমরা আবদ্ধ, তার মধ্যে প্রতিদিন আমরা তলিয়ে যেতেই থাকব।

সমাপ্ত